Vol. 33 | No. 2 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সামন্তযুগে বাংলা ভাষার কবিদের সাহিত্যাদর্শ

Volume	33
Issue	2
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর রহমান
Published online	February 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i2.6
Pages	159-178
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সামন্তযুগে বাংলা ভাষার কবিদে

Check for updates

সাঈদ-উর রহমান

অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত কালকে সাধারণভাবে বাংলাদেশের সামন্তযুগ ধরা হয়। সেযুগের প্রথমদিকে সংস্কৃতভাষায় ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্যচর্চা হতো; একেবারে শেষের দিকে ফারসীও সাহিত্য-চর্চার বাহন হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল। আর পুরো সময়েই বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ধারক হিসেবে সংস্কৃতের মর্যাদা ছিল অসাধারণ। সে-সংস্কৃতির অংশিদার ও উত্তরাধিকারী হিসেবে বাঙালী কবিরা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, দূতকাব্য, নাট্যকাব্য ও চম্পূকাব্যসহ বিভিন্ন আঙ্গিকে সাহিত্যসাধনা করতেন। জয়দেব, উমাপতিধর, সন্ধ্যাকরনন্দী, চতুর্ভুজ, কবিকর্ণপুর, বিদ্যাকর, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী, বিষ্ণুদাস প্রমুখ কবি সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙালীদের সংস্কৃত রচনারীতি 'গৌড়ী রীতি' নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাঁদের আবির্ভাবের পূর্বেই।

তেরো থেকে আঠার শতক অবধি দরবারী ভাষা ছিল ফারসী। রাজকার্যের প্রয়োজনে আগ্রহী ব্যক্তিদের ফারসী শিখতে হতো। ফারসী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও স্থাপিত হয়েছিল প্রথমদিকে। বাংলার এক সুলতান কবি হাফিজকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ করেছিলেন চোদ্দ-পনের শতকের সন্ধিক্ষণে। ফারসী সাহিত্যের বেশ কয়কটি কাব্যকাহিনী বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে মধ্যযুগে। বহিরাগত ফারসী কবিরা দরবারের পরিবেশে ফারসীতে কবিতা রচনা করতেন। মোগল যুগে বিখ্যাত ফারসী কবিরা ছিলেন আজাদ আল হোসাইনী, সৈয়দ গোলাম হোসেন ও মির্জা জান তাপিস। একজন বাঙালী শেখ ইজ্জতুল্লাহ ফারসী ভাষাতে রচনা করেছিলেন তাজুলমুলক গুলে বকাওলী (১৭২২)। এটা উর্দুতে ও বাংলায় অনূদিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করা মর্যাদার ব্যাপার ছিলনা সেকালে। সৃজ্যমান বাংলা ভাষা তার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশক্ষমতা নিয়ে তখনও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। বাংলা নামও সর্বজনস্বীকৃতি পায়নি তখন। ভাষা, বুলি, লৌকিক ভাষা, দেশি ভাষা ইত্যাদি নামেই এর পরিচয় ছিল। তবে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছিল স্পষ্টভাবে। সমাজে ভাঙ্গাগড়ার প্রেক্ষাপটে সমাজহিতৈষী কবিরা লৌকিক ভাষার দ্বারস্থ হচ্ছিলেন ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়।

লৈখিক সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে ধর্মবিষয়ক রচনা। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সবাই নিজ-নিজ ধর্ম নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কারণ সহজে অনুমান করা যায়। সামন্তযুগের বাংলাদেশ ছিল ধর্মকলহে মুখর। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া বৌদ্ধ ও সূফী দরবেশরা যার-যার ধর্মমত জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার তাগিদে জনি ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন। আলেমগণ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জন্য রচনা করেছিলেন শরীয়ত ও মারেফতের বই, কিংবা ইসলামী পৌরাণিক কিসসা-কাহিনী; ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজকে সংহত করার আপ্রাণ প্রয়াসে লৌকিক—পৌরাণিক ধর্মের কাহিনী লৌকিক ভাষার মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছিলেন তাদের কাছে; সহজিয়া বৌদ্ধরা সে আশায় তুর্কী অভিযানের পূর্বে রচনা করে-ছিলেন চর্যাগীতি পদাবলী। উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু কবিরা লৌকিক কাব্য রচনা করেছেন দেব ভাষায়, কিন্তু লৌকিক ভাষায় রচনা করেছেন দেবকাহিনী।

এর বাইরে একটি শক্তিশালী ধারা ছিল রোমান্স কাব্যের। সেখানে ছিল মুসলমান কবিদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

দুই

মধ্যযুগে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের লেখাপড়ার জন্য ছিল টোল ও চতুষ্পাঠী; আর মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা। পাঠশালা ও মকতবে সাধারণ ঘরের ছেলেরা লেখাপড়া করতো। হিন্দু ছেলেদের অনেক বিষয় পড়তে হতো—সাহিত্য ও সাহিত্যশাস্ত্র ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। বিদ্যাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালে রচিত কাব্যের পাত্রপাত্রীদের পাঠ্যতালিকা থেকে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গল কাব্যের অন্যতম

প্রধান চরিত্র শ্রীমন্ত গুরুগৃহে পড়েছিল ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, কালিদাসের মেঘদূত-রঘুবংশ—কুমারসম্ভব, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, কবিরাজের রাঘবপাণ্ডবী, হালের গাথাসপ্তশতী ও গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী। নাটক পাঠ্য ছিল বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস, মুরারিমিত্রের অনর্ঘরাঘব, হর্ষরচিত রত্নাবলী, ভবভূতির মালতীমাধব ও বেরারের জয়দেব রচিত প্রসন্নরাঘব। সুবন্ধুরচিত গদ্য আখ্যায়িকা বাসবদত্তাও তাঁর পাঠ্য তালিকায় ছিল। সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক বইয়ের মধ্যে শ্রীমন্ত পড়েছিল দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথ বিরচিত সাহিত্যদর্পণ ও পিঙ্গলের ছন্দঃশাস্ত্র। শুধু চণ্ডীমঙ্গল নয়, অপরাপর কাব্য থেকেও প্রায় অনুরূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়। তা থেকে বোঝা যায়, একজন কৃতবিদ্য ছাত্র শুধু সাহিত্যকর্মেরই নয়, সাহিত্যশাস্ত্রেরও পরিচয় লাভ করত।

মাদ্রাসায় অধীত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না, তবে ফিকাহ, হাদীস ও কোরানের পাশাপাশি অলংকার শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও বাগ্মিতা বিদ্যা তাদের অবশ্যপাঠ্য ছিল।

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাহিত্যশাস্ত্র দুক্ষেত্রেই প্রতিভাবানদের আবির্ভাব হয়েছিল। বিখ্যাত সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা হলেন ভরত (খ্রীঃ পূঃ ২ শতক থেকে খ্রীস্টাব্দ ২ শতক), ভামহ (৬ষ্ঠ শতক,) দণ্ডী (৭ম শতক), বামন, (৭ম-৮ম শতক) উদ্ভট (৮ম শতক), লোল্লট (৮ম শতক), আনন্দ বর্ধন (৯ম শতক), রুদ্রট (৯ম শতক) মম্মটভট্ট ১০ম শত ক), কুন্তক (১০ম শতক), অভিনব গুপ্ত (১০ম শতক), রাজশেখর (১০ম শতক) ও বিশ্ব-নাথ (১৪ শতক)। তাঁদের মূল লেখার ওপর রচিত হয়েছিল অসংখ্য টীকা-ভাষ্য। আচার্যদের কেউ বাঙালী ছিলেননা, কিন্তু তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বঙ্গভাষী এলাকায়। বাঙালী পণ্ডিতেরা সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থ যেমন রচনা করেছিলেন, তেমনি আচার্যদের লেখারও টীকা রচনা করেছিলেন। ষোল শতকের কয়েকজন বাঙালী আলং-কারিক ছিলেন কবিকর্ণপুর (অলংকার কৌস্তভ), কবিচন্দ্র (কাব্যচন্দ্রিকা), রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি(রহস্য প্রকাশ, ও কাব্যরত্নাবলী)। সতের শতকের চিরঞ্জীব রচনা করেছিলেন 'কাব্যবিলাস'। টীকাকারও ছিলেন কয়েকজন ঃ মম্মটভট্টের টীকা রচনা করেছিলেন পরমানন্দ চক্রবর্তী, পুণ্ডরীকাক্ষ

বিদ্যাসাগর (নবদ্বীপ), জগদীশ তর্কালংকার (নবদ্বীপঃ ১৬ শতক), মহেশ্বর ন্যায়ালংকার (শ্রীহট্ট : ১৬ শতক) ও গদাধর ভট্টাচার্য (নবদ্বীপ : ১৭ শতক); দণ্ডীর কাব্যাদর্শের ভাষ্যকার ছিলেন ত্রিভুবনপাল দেব, পদ্মনাভ মিশ্র (১৭ শতক) ও মহেশ্বর ভট্টাচার্য। বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের টীকাকার হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে রামচরণ বিদ্যাবাগীশকে; আর পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর আরেকটি টীকা রচনা করেছিলেন বামনের 'কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তির'। এগুলো থেকে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের এদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচয় মেলে।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কাব্যশরীর ও পাঠকের গ্রহণক্ষমতার ওপর। বিষয়ের মৌলিকত্ব বা কবির প্রতিভা তাদৃশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। কোন কোন উৎস বা আকরগ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করা যাবে তার বিস্তারিত তালিকা আলংকারিকেরা তৈরি করেছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, প্রমাণবিদ্যা, সমরবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে তিনি বিষয় গ্রহণ করবেন। বিষয়ের মৌলিকত্ব নয়, রচনার চমৎকারিত্বই বিশেষ বিবেচ্য ছিল তাঁদের কাছে। রচনাকে চমৎকার করে তোলার জন্য কাব্যশরীরের ওপর সর্বাধিক নজর দেওয়া হয়েছে। শব্দ ও অর্থকে অলংকার সজ্জিত করে পাঠকমনে অলৌকিক রসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা কবির উদ্দিষ্ট ছিল। সেজন্য কবি ও পাঠক উভয়ই বিদগ্ধ পুরুষ হবেন। সবাই কবি হতে পারেন না; আবার সবাই যথার্থ পাঠকও হতে পারেন না। যিনি দৈব আশীর্বাদপুষ্ট ও কাব্য রচনার কলাকৌশল আত্মস্থ করে বিদগ্ধ, তাঁর পক্ষেই কবি হওয়া সম্ভব। স্বভাব কবির স্থান ভারতীয় শাস্ত্রে নেই। তেমনিভাবে পাঠকও হবেন রসগ্রহণের উপযুক্ত।

সেই পটভূমিকায় সাহিত্যশাস্ত্র আলাদা শাস্ত্রের মর্যাদা নিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। নতুন কবিদের শিক্ষার ও ব্যবহারের জন্য রচিত হয়েছিল আলাদাগ্রন্থ। জনপ্রিয় ছিল তিনটি বই—রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' ও ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'ঔচিত্যবিচার' ও 'কবিকণ্ঠভরণ'। বইগুলোতে নির্দেশিত হয়েছে কবিতার বিষয়, আকর গ্রন্থাদি, কবির জীবনপ্রণালী, কবির শ্রেণীবিভাগ, সাধারণ স্তর থেকে "কবিরাজ' পর্যায়ে উন্নীত হবার স্তরসমূহ, বাক্য-শব্দ-ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য, কাব্যের দোষ ত্রুটি, কাব্যে

দেবতাদের ভাষাভঙ্গী ও কবিতায় চুরি প্রভৃতি। কবির জীবনপ্রণালী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি অতিপ্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে ধর্মীয় কর্তব্য সমাপনান্তে তিন ঘন্টা কবিতা-সম্পর্কিত বিষয়াদি অধ্যয়ন করবেন ও পরের তিন ঘন্টা কবিতা লিখবেন; দুপুরে স্নানাহারের পর কাব্যালোচনায় সময় কাটাবেন। অপরাহ্নে নির্বাচিত সাহিত্যরসিক বন্ধুদের সাথে সকালে রচিত অংশগুলোর দোষগুণ বিশ্লেষণ করে তা পুনরায় লিখবেন। রাত্রে তিনি ছয় ঘন্টা নিদ্রা যাবেন ও পরদিন প্রভাতে গতদিনের রচনার মূল্যায়ন করবেন।[১]

এই ভাবে কবির জীবন যেমন বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল, কাব্য-সাধনা ও ধর্মসাধনার মধ্যে তেমনি পার্থক্য ঘুচে গিয়েছিল। কবিতার বিষয় ছিল দেবতার লীলাখেলা বা উত্থানপতন কিংবা আদর্শায়িত মানবজীবন। কাব্যগুরু হতো ভগবান, সরস্বতী, ও দেবতার বন্দনা পূর্বক আশীর্বাদ যাচঞা করে। কাব্যরচনা ও কাব্য পাঠের ফল ছিল ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ। সাহিত্যশাস্ত্রের আদি রচয়িতা আচার্য ভরত পরিচিত ছিলেন ভরতমুনি রূপে।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শাস্ত্রে কবি-প্রতিভা গুরুত্ব পায়নি, কবি-প্রতিভা কিভাবে রচনায় প্রতিফলিত হবে সেটাও বিবেচিত হয়নি। চারপাশের জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক বিশ্লেষণে আসেনি। পাত্র ও পাত্রীদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ আচার্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তারা সমালোচক ছিলেন না, ছিলেন টীকাকার। মোহিত লাল মজুমদারের অভিমত হচ্ছে—'আমাদের দেশে বহুকাল পূর্বে যে ধরনের কাব্যবিচার প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহাকে Metaphysics of Aesthetic Sentiment বলা যাইতে পারে। কাব্যবস্তুকে প্রাধান্য না দিয়ে কাব্যের বহিরঙ্গটাকেই মুখ্য স্থির করিয়া কাব্যের যে স্বাদতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় মনীষার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু এই বিচারের মধ্যে মধ্যযুগের scholasticim বিষয়নিরপেক্ষ যুক্তিপ্রাণতাই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। যে সৃষ্টিশক্তি বা Imagination আধুনিক কাব্য জিজ্ঞাসার নিকট প্রধান বিচার্য বিষয়, আলংকারিকগণ কুত্রাপি তাহার মূল্য নির্ধারণ করেন নাই।'[২] সেজন্য কবিতা হয়ে উঠেছিল শরীরকেন্দ্রিক ও প্রসাধনসর্বস্ব। তৎকালের

সমাজকাঠামোর ছবি মনে থাকলে সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক মনে হয়না। সমাজে কাঠামো ছিল অনড়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ছিল অস্বীকৃত। সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব ধারণ করেছে তাকেই।মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা কাব্যচর্চা করেছিলেন সেই পটভূমিকায়।

তিন

দৈবঅনুগ্রহ ব্যতীত কাব্যসাধনায় সাফল্য লাভ করা যায়না, সে-বিশ্বাস প্রাচীনকালের মত মধ্যযুগের কবিদের মনেও ছিল। বিজয়গুপ্ত, রূপরাম, মানিকরাম, ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম দেবতার নির্দেশেই কবিতা-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন; স্বয়ং রামচন্দ্র তীরের অগ্রভাগ দিয়ে বালক নিত্যানন্দের জিভে মহামন্ত্র লিখে দেবার পরই কেবল তার কবিত্বশক্তি জাগ্রত হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে দেবতার বা ফিরিশতার দেখা পাওয়া অসুবিধাজনক হওয়ায় তাঁরা ভক্তিভরে আশীর্বাদ কামনা করতেন আল্লাহর বা তাঁর প্রিয়পাত্রদের। হেয়াত মামুদ নবিনন্দিনী বিবি ফাতেমার ভরসা করেই জঙ্গনামা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন ঃ

বিবি ফাতেমার পদ শিরেতে বন্দিয়া।
রচিব পুস্তক আমি কিতাব দেখিয়া॥
আপনে করিবে মাতা মোর তরে দয়া।
উত্তম করিয়া পদ দিবেন জোটায়া॥
তবে সে রচিতে পারি কিতাবোর বাণী।
মোর কণ্ঠে মিত্রাক্ষর জোটাবে আপনি।

দেবতার নির্দেশ শুধু নয়; পিতামাতা, গুরু, উপাস্য, চারপাশের দেবতা, পীর, গাজী সবার আশীর্বাদ কবির সফলতার জন্য দরকারী বলেবিবেচিত হতো। ইসলাম ধর্মের অনুসারী কবিরা 'বচন' বা 'বাক্য'কে অলৌকিক মহিমান্বিত বিবেচনা করে তার মাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন। ষোল শতকের হিন্দি সাহিত্যের কবি মনঝন বলেছেন যে, আদি সৃষ্টির পূর্বে বচন ছিল হরিমুখনিঃসৃত আদি ওঙ্কার। পরে তা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়।[৩]

কাব্যসাধনা যে ধর্ম সাধনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তা ভালোভাবে জানা যায় কাব্য পাঠের ফলশ্রুতি থেকে। প্রায় সব কবিই কাব্যের

ফলশ্রুতি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেছেন। মুকুন্দরাম হিন্দুসমাজের সব বর্ণের যথোচিত লাভের আশা দিয়েছেন অভয়ামঙ্গল পাঠকদের। গায়ক, শ্রোতা ও ব্যাবস্থাপক—সবাইকে দেবি বরদান করেন।

ব্রাহ্মণে শুনিলে ধর্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি॥

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়ের' শ্রবণ করার ফল 'ধন-জন-বৃদ্ধি হয় বিঘ্নবিনাশন'। শ্রী মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রবণের ফল হচ্ছে : 'সুখ মোক্ষ দুই হয় ইহাত শুনিলে।' ময়ূর ভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের ফলশ্রুতিও অনুরূপ :

সাংজাত খণ্ড নাম ধর্মবিবরণ।
শ্রবণে পঠনে সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥
ধনপুত্র মান্যবৃদ্ধি হয় দিনদিন।
শ্রীধর্মপ্রসন্ন তাকে রহে চিরদিন॥
সর্ব্বতীর্থ ফল পায় নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্রে বিজয় লভে হয় শত্রুক্ষয়॥

মালাধর বসু তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের শ্রোতাদের বিমানে চড়ে বৈকুণ্ঠ পুরী গমন করার সম্ভাবনার কথাও শুনিয়েছেন :

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—যে যার বাসনা।
যে যাহা বাঞ্ছয়ে তাহা করান রচনা॥
ইহা বুঝি লোকসব শুন সাবধানে।
যাইবে বৈকুণ্ঠপুরী চড়িয়া বিমানে॥

দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত আলংকারিকেরা কাব্যপাঠের দ্বারা অলৌকিক রস আস্বাদনের যে-তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, বাঙালী কবিরা তা উপেক্ষা না করেও কাব্যকে জীবনেরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। হিন্দু সমাজের চারটি সনাতন আদর্শ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—অর্জিত হতো কাব্য পাঠ করে। মধ্যযুগের বাঙালী দেবতাকে ঘরের সামগ্রী বানিয়েছিল, কৈলাস

স্থাপিত হয়েছিল পানা পুকুরের পাশে। ধর্মকাব্য সে-অর্থে সেক্যুলার বা ইহজীবনমুখী হয়েছিল। কাব্যপাঠ করে ইহজীবনের সমস্যার সমাধান হওয়ার ভরসা ছিল। ধর্মের তাৎপর্য ছিল পুণ্যার্জনে ও দেবতার আদর্শে জীবন-পরিবার-সমাজ গঠনে। কাব্যগুলো সে-অর্থে, ধর্মলাভে সাহায্য করত। প্রায় সব কাব্যেই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করে, ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় দেখিয়ে পাঠক-শ্রোতাকে সে-লক্ষ্যে প্রবর্তনা দিত। কাব্যপাঠের দ্বারা বাস্তবজীবনে অর্থ লাভ কেমন হতো জানা যায়নি, তবে দু'শ্রেণীর লোক, কবি ও গায়েন, এর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাম বাসনা অর্থাৎ পরোক্ষ ইন্দ্রিয় সুখ পরিতৃপ্তির কাজে সে-যুগের কাব্য যে সাহায্য করত, তার অনুমান মেলে। সেকালে প্রেম ও কামে পার্থক্য বেশি টানা হতোনা, আদি রসের চর্চাকে জীবনের অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। মধ্যযুগের এক প্রান্তে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, অপরপ্রান্তে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। দুইই আদ্যন্ত আদি রসের কাব্য। মুসলমান কবিরাও প্রতিটি রোমান্সে কামকেলীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। মধ্যযুগের বাঙালী রতিশাস্ত্রের বেশ কয়টি পুঁথি রচনা করেছিলেন। ইংরেজ আমলে ভিকটোরিয়ান নৈতিকতার ক্ষুরে মাথা কামানোর আগ পর্যন্ত আদিরসের চর্চা বাঙালী সমাজে বেশি নিন্দনীয় ছিল না।

চতুর্থ আদর্শ অর্থাৎ মোক্ষ লাভের জন্য বর্ণহিন্দুরা উপনিষদ পাঠ করত। শূদ্রদের জন্য উপনিষদ পাঠ নিষিদ্ধ থাকায় লৌকিক কাব্য পাঠ-শ্রবণ করলেই তাদের মোক্ষলাভ হবে বলে কবিরা জানিয়েছেন।

মুসলমান কবিদের প্রণয়োপাখ্যান রচনার প্রসঙ্গটি এখানে আলোচিত হতে পারে। তারা প্রেমবাণী ভিত্তি করেছিলেন মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষায়ই —কারণ তাদের মতে, পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ প্রেমের কারণে এবং আল্লাহ প্রাপ্তির পথ শেষ পর্যন্ত প্রেমেরই পথ। শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য রচনা করেছিলেন 'প্রেম রসে ধর্মবাণী' বলার জন্য। দোনাগাজী চৌধুরী বিশ্বাস করতেন যে 'আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ'। আলাওল লিখেছিলেন—'প্রেমভাবে সংসার সৃজিলা করতার।' প্রেম থেকে জন্ম নেয় বিরহের অনুভূতি। যার মনে বিরহ-বোধ জাগ্রত হয়, তার মুক্তিলাভ হয় সহজে ;

যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল।

সে জন্যই তিনি রচনা করেছিলেন 'প্রেমপুথি পদ্মাবতী।'

সূফী সাধকদের রচিত কাব্যে প্রেমের প্রসঙ্গটি আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে। আলী রজা তাঁর 'জ্ঞানসাগর' কাব্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে ছেন যে, প্রেমের কারণেই আল্লাহ সমস্ত পৃথিবী ও জীবজগত সৃষ্টি করেছেন; বিভিন্ন ধর্মের সাধকেরা প্রেমসাধনার দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং আল্লাহ জানিয়েছেন যে, প্রেমের বলিদানে যে তাকে পূজা করে, সে-ভক্ত পুনর্জন্মের মত ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

প্রেমহেতু করিলে সংসার সৃজন
প্রেমরসে বান্ধিয়া সৃজিল ত্রিভুবন।
... .
প্রেম ভক্তিভাবে মোরে ভজে জথ জন
প্রেম বলিদানে মোরে জে করে পূজন।
মোর নামে নাম সত্য রাখিমু তাহার
সে সবারে পুনর্জন্ম না করিমু আর।

প্রেমতত্ত্ব ও প্রেমপদ্ধতি প্রচারের জন্যই সূফীরা রচনা করেছেন তাদের বিবিধ কাব্য।

কাব্যপাঠে আনন্দ লাভের বিষয়টি এত সাধারণ সত্য যে, তার উল্লেখ বাহুল্য মনে হয়েছে কবিদের কাছে। তবু কেউ-কেউ এর উল্লেখ করেছেন। কলিকালে পাপচিত্ত মানুষেরা পাঁচালীর রসে উৎসাহী হওয়ায় পনের শতকের কবি মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয় পাঁচালীর ঢংয়ে লিখেছিলেন। সতের শতকে আলাওল সিকান্দার নামা রচনা করার কালে পাঠক-মনে আনন্দ সৃষ্টির আশা করেছিলেন। মনে হয় ভগবৎ-'সাধনাকে আনন্দদায়ক করার আশায় কবিরা পয়ার-পাঁচালীর আশ্রয় নিয়াছিলেন। এর সঙ্গে প্রাচীন আলংকারিকদের রসের প্রসঙ্গটি যোগ করা যায়। মধ্যযুগের সব কবিই রস শব্দের ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ হামজা

আশা করেছেন—'রসিক মজিবে শুনে আমার কবিতা'। শাহ মুহম্মদ সগীর প্রেমরসের উল্লেখ করেছেন; আলাওল 'প্রেম-ভাব-রস' এক সূত্রে গেঁথেছেন। বৈষ্ণব কবিরা রস সৃষ্টির জন্য পদাবলী রচনা করেছিলেন। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের উক্তি 'যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্যরস লয়ে' সবারই মনে আছে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে, কাব্যপাঠে রসের সৃষ্টি হয় এবং রসের অনুভূতি ব্রহ্মস্বাদতুল্য। বাঙালী কবিরা কাব্যরচনা ও পাঠ করে ভগবানকে পেতে চেয়েছেন; একই সঙ্গে যে আনন্দদায়ক রসের জন্ম হয় তা-ও উল্লেখ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের বিরাট অংশকে প্রচলিত ইতিহাসসমূহে অনুবাদের পর্যায়ে ফেলা হয়। আহমদ শরীফ সমগ্র সামন্তযুগের রচনাবলীকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও মৌলিক রচনা শীর্ষে বিভক্ত করেছেন। আরো অনেক খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ অনুবাদ শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, রোমান্সকাব্য প্রভৃতির মূল সংস্কৃত-ফারসী-হিন্দি গ্রন্থ; মৌলিক বলে চিহ্নিত রচনাসমূহের বিষয়ও কোন-না-কোন উৎস থেকে নেয়া। ইসলামী শরীয়তি বা পৌরাণিক কাহিনীর আকর ফারসী বা আরবী কেতাব। মঙ্গলকাব্যের দেবতার কাহিনী ভ্রূণ রয়েছে পুরাণে।

প্রশ্ন করা যায়, রচনাগুলোকে অনুবাদ বলা সংগত কিনা। মধ্যযুগের তথাকথিত অনুবাদগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "অনুবাদ কখনো মূলানুগ হয়নি, বিষয়ে হলে ব্যঞ্জনায় হয়নি, ব্যঞ্জনায় হলে ছন্দে হয়নি—এমন নানা ত্রুটি দেখা যায়। তা ছাড়া এঁরা নিজেদের সামর্থ্য রুচিবুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে মূলের পাঠ গ্রহণ-বর্জনের ও সংক্ষেপনের এবং ইচ্ছেমত সংযোজনের স্বাধীনতা নিজেদের হাতেই রেখেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবশ্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু দর্শন-ইতিহাস-চিকিৎসা-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞান তথ্য ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক পন্থা। মধ্যযুগের অনুবাদে তাও হয়েছে। এজন্যে মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় কোন তথাকথিত অনুবাদই নির্ভরযোগ্য নয়। সবগুলোই কিছু কায়িক, কিছু ছায়িক,

কিছু ভাবিক অনুবাদ এবং কিছু স্বাধীন রচনা—তা কবির গায়কের পাঠকের কিংবা লিপিকরেরও হতে পারে।"[৪]

ব্যর্থতার দায় থেকে কবিদের মুক্তি দেয়া যায় একটি সাহিত্যাদর্শ স্মরণে রাখলে। একালে যে অর্থে অনুবাদ শব্দটির ব্যবহার করা হয়, মধ্যযুগে তার চল ছিল না। মধ্যযুগের সাহিত্যের গায়ে অনুবাদের লেবেল দেয়া হলে, একালের সাহিত্যচিন্তা সেকালের ওপর আরোপ করার মত ব্যাপার ঘটে। সাহিত্য রচনার জন্য সেযুগে বিষয়ের মৌলিকতা কোন শর্ত ছিল না। দেবতার মত দেবতার কাহিনীতেও সবার অধিকার ছিল। কোন কোন আকর গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করা যাবে তার তালিকা সংস্কৃত আলংকারিকেরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেগুলো থেকে বিষয় চয়ন করে ও লেখকের মনোভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিরাসমকালের পরিপ্রেক্ষিতে সাজাতেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক নন, তিনি রামকথার বাঙালী ভাষ্যকার বা রূপকার। ঐতিহাসিকের অভিমত হচ্ছে : 'মূল বাল্মীকি হইতে কাহিনীর সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃত্তিবাস স্বীয় কল্পনার সহিত পুরাণ ও অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা মিশাইয়া দিয়া পুরাতনী রামায়ণী কথাকে বাংলাদেশের মনোভাবের অনুকূলে বর্ণনা করিয়াছেন।'[৫] অনুবাদ বলে পরিচিত অন্যান্য সাহিত্যকর্ম প্রসঙ্গে এ-মন্তব্য মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। রোমান্সকাব্যগুলোও অনুরূপ বিশিষ্টতার অধিকারী। মূলের সবচেয়ে বেশি ধার ঘেসে যাওয়া আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য সম্পর্কে কাব্য সম্পাদক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'আলাওল হিন্দী কাব্যটিকে বাংলায় রূপান্তর কালে পরিবর্জন, পরিবর্তন, সংযোজন এবং সংক্ষেপ ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে অনুবাদকে শেষ পর্যন্ত অন্য এক পরিণতি দান করেছেন।'[৬] দোনাগাজী চৌধুরীর সায়ফুলমুলক বদি-উজ্জামাল কাব্যটিকে আহমদ শরীফ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থে অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত রেখেছেন, কিন্তু সম্পাদিত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—'এতে বোঝা যায়, কেউ কারো গ্রন্থের অনুবাদ বা অন্ধ অনুসরণ করেননি। স্বাধীন অনুসৃতিই সর্বত্র দৃশ্যমান'।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অনুবাদ নামে অভিহিত রচনাগুলো প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের একটি কাব্যাদর্শকেই প্রকাশ করছে। সেগুলো অনুবাদ নয়, বরং কোন আকর কাব্য থেকে কাহিনী নিয়ে স্বদেশের

স্বসমাজের পটভূমিতে রচিত নতুন কাব্য। মেঘনাদবধকাব্য যেমন মৌলিক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীও তেমনি মৌলিক।

এই প্রসঙ্গে সেকালের সাহিত্যের বিষয়-আশয় ও পাত্রপাত্রীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যায়। জীবন ও সমাজের সব বিষয়ই কবিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য রচনার লক্ষ্য ছিল স্বর্গে প্রতিষ্ঠাকামী দেবদেবীর মর্তে পূজাপ্রচার করার কাহিনী বর্ণনা করা। অভিশপ্ত দেবতার মানুষরূপ ধারণ করে ধরাতলে আগমনের সাথে-সাথে কাহিনীও মাটিতে নেমেছে এবং মনুষ্য সমাজের সমস্ত কিছু স্পর্শ করে বিকশিত হয়েছে। আহার-বিহার, বিয়েশাদী, জন্মমৃত্যু, চাষবাস, ব্যবসাবাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, প্রেম-সংগম, কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি কবিদের নজর থেকে। মঙ্গলকাব্যসমূহে সেগুলো অবশ্যই পার্শ্বকাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অংশ নিয়ে স্বতন্ত্রভাবেও কবিতা রচিত হয়েছিল। কামশাস্ত্র, কবিরাজী, পুঁথি, জ্যোতিষচন, ফালনামা ও সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক পুঁথি ছিল; তামাক সেবন মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত হয়েছিল অন্তত চারটি পুথি; বিয়ে-বিষয়ক নিকাহ-মঙ্গল পুঁথিও রচিত হয়েছিল।

অর্থাৎ কাব্যিক বিষয় বলতে কোন কিছু কবিরা আলাদা করেননি; জীবনকে তারা সমগ্রভাবে ধরার চেষ্টা করেছিলেন কবিতায়।

তবে একই কথা বলা যাবেনা কাব্যের পাত্রপাত্রী নির্বাচনের বেলায়। সেখানে তাদের সীমাবদ্ধতা বা পছন্দ-অপছন্দ ছিল। কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। ধর্মকাব্যের পাত্রপাত্রীরা ছিল দেবতা; বা মানুষের কায়ায় স্বর্গভ্রষ্ট দেবদেবী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান চরিত্র রাধা ও কৃষ্ণ; দু'জনেই লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর অবতার। মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখিন্দর ও চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা যথাক্রমে ঊষাঅনিরুদ্ধ ও নীলাম্বর-ছায়া। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের চরিত্রগুলো এমনিতেই স্বর্গের অধিবাসী। রোমান্স কাব্যের নায়ক-নায়িকা এসেছে রাজপরিবার থেকে; দু'একজন ছিল পরীজাত ও সওদাগর শ্রেণীর। মুসলমান রচিত অপর এক শ্রেণীর কাব্যের পাত্রপাত্রীরা ছিল নবী মুহম্মদ ও তাঁর বংশধর—আমীর হামজা, হানিফা, হাসান-হোসেন প্রমুখ।

সুতরাং সামন্তযুগের কাব্যের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে নির্দিষ্ট চরিত্র ছিল—তারা অভিজাতদের ছেড়ে সাধারণ মানুষের স্তরে নামতো না।

আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমে দেখা যায় কবিতার বিবৃতিধর্মিতা ও বর্ণনামূলকতা। ইংগিতধর্মী কবিতা সেকালে বিশেষ পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম হিসেবে চণ্ডীদাসের পদাবলীর উদাহরণ দেয়া যায়। ব্যতিক্রম এ কারণে যে, মধ্যযুগের কাব্যের মূল ধারার কবি তিনি নন। মূল ধারাটি বিদগ্ধ সাহিত্যের। অপরদিকে চন্ডীদাস স্বভাব কবি। বিদগ্ধ সাহিত্যের ধারায় তিনি আসেননা। বিদগ্ধ সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনামূলকতা। সে বর্ণনা অনেক ভাবে এসেছে। বার-মাস্যায় বিরহিণী বা ফুল্লরার মত দুঃখিনী ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে তার অবস্থা বর্ণনা করেছে। সেসূত্রে প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে, প্রকৃতির সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় চৌতিশার মধ্য দিয়ে। বাংলা বর্ণমালার চৌত্রিশটি ধ্বনি দিয়ে শব্দ তৈরি করে দেবির স্তব করা হয়েছে। সৈয়দ সুলতান এভাবে একটি কাব্যই রচনা করেছেন। আরেকটি বর্ণনামূলক অংশ থাকে একই জাতীয় বস্তুর বর্ণনায়। সেটা অনেকটা তালিকা নির্মাণের মত। কাব্যের শুরুতে প্রায় প্রত্যেক কবি ভগবান, দেবতা পিতামাতা, গুরু, প্রভৃতির বন্দনা সমাপ্ত করেন। ধর্মমঙ্গলের কবি মানিকরাম দিগবন্দনায় ১৪৪ পংক্তি জুড়ে ধর্মঠাকুরের যত স্থানীয় বৈচিত্র্য আছে সবার নামের উল্লেখ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত বই কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, যা ডক্টর সুকুমার সেনেরে মতে 'মহৎ বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতার জন্য লেখা।' এই কাব্যের বিয়াল্লিশটি অধ্যায়ের মধ্যে তেরটি অধ্যায়ের শিরোনাম বর্ণনযুক্ত—যেমন বাল্যলীলা বর্ণন, কৈশোরলীলা বর্ণন, মাধুর্য বর্ণন প্রভৃতি। চন্ডীমঙ্গলে যাকে শাকতোলার বিবরণ, রান্নার বর্ণনা, সাধের বর্ণনা, জাতির বর্ণনা, ফুলের বিবরণ, গাছের বিবরণ, খাবারের বিবরণ প্রভৃতি। সার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে ভোজনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ৫৮৮ পংক্তিতে। চণ্ডীমঙ্গলের সেরা কবি মুকুন্দরাম বনকর্ত্তনের পালা রচনা করেছেন ২৬৫ শব্দে, তন্মধ্যে ২০০টি গাছের নাম। রোমান্স কাব্য রচনায় কবিদের ব্যাঞ্জনামণ্ডিত শব্দ ব্যবহারের সুযোগ বেশি ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তারা

বিবৃতি রচনার লোভ এড়াতে পারেননি। দোনাগাজী চৌধুরীর রচনারীতি সম্পর্কে সম্পাদক আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন—'সুন্দর ও কদাকার, শান্ত ও হিংস্র, আশ্চর্য ও বিভীষিকাময়, স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণীর বিস্তৃত বর্ণনায় কবির উৎসাহ অশেষ। ···সংযত বর্ণনার সৌন্দর্য বুদ্ধি তাতে অনুপস্থিত। বাক্-জাল বিস্তারের আগ্রহই তাঁর বিশেষ প্রবল।'[৭]

একটু আপত্তি উঠতে পারে পদাবলীর আঙ্গিক নিয়ে। পদাবলী সীমিত আকারের গীতিকবিতা বিধায় সেখানে বিবৃতির বিশেষ সুযোগ কম। তবু, পদাবলী বর্ণনামূলক কবিতা। দ্বিজ চণ্ডীদাস যখন প্রেমতত্ত্ব নিয়ে কবিতা রচনা করেন, তখন তিনিও বর্ণনামূলকতা বা তালিকা নির্মাণ পরিহার করেন না। তার একটি বিখ্যাত কবিতায় এর নিদর্শন মেলে:

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাধিব ঘর
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনে সকলি পর।
পিরীতি দ্বারের কপাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল
পিরীতে মজিয়া সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল।
পিরীত-পালঙ্কে শয়ান করিব
পিরীতি শিথান মাথে
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব
থাকিব পিরীতি সাথে।
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি বসন লব
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরান দিব।
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ান কোণে
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।

একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার কৌশল আরো কেউ-কেউ ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাপতির বিখ্যাত 'যহা যহা পদযুগ ধরই/তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই' পদের আদর্শে গোবিন্দদাস রচনা করেছেন 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি/তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি' পদটি। জ্ঞানদাসের 'মুরলী করাও উপদেশ' পদে 'কোন মন্ত্রে' ব্যবহৃত হয়েছে বারংবার। দোনাগাজী চৌধুরীর কাব্যে বদিউজ্জামাল পরীর দীর্ঘ বিলাপটিতে 'আহা', 'আহারে' দিয়ে ২১ পংক্তি, 'কি কৈলি' দিয়ে ২৪ পংক্তি, 'কথা গেল' দিয়ে ৬১ পংক্তি এবং 'কে নিল কে নিল' দিয়ে ৪৪ পংক্তি শুরু হয়েছে।

একই শব্দ বা বাক্যাংশ বারংবার ব্যবহার করাকে পুনরুক্তি দোষ বলে বিবেচনা করলে চলবে না; এটি একটি মধ্যযুগীয় কৌশল। সেকালের কবিরা এর বহুল ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য যুগের নামকরা কবিদের প্রায় সকলেই নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কবিত্বে সাফল্যের জন্য প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থ; ব্যাকরণ অভিধান, ছন্দ, অলংকারশাস্ত্র প্রভৃতির ওপর দক্ষতা থাকার দরকার ছিল। কবিদের জীবনী সম্পর্কে যা জানা যায়, তা থেকে তাদের অধীত বিদ্যার ব্যাপকতা তথা পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। চর্যাকার কাহ্নপা, সরহপা, ভুসুকুপা, সবর পা, ডোম্বীপা প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিদ্যমান। বিদ্যাপতি ছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক—বই লিখেছেন সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও মৈথিল ভাষায়, অনেক বিষয়ে। কৃত্তিবাসের উপাধি ছিল পণ্ডিত; নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি/ পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী।' কবি শাবিরিদ খান কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর ছিল অসামান্য পাণ্ডিত্যপ্রীতি। তেমনিভাবে মুকুন্দরাম, রূপরাম, মানিকরাম, বিপ্রদাস, আলাওল, কাজী দৌলত, রামেশ্বর, কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, রামানন্দ যতি, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবির কাব্য থেকে তাদের পাণ্ডিত্যের ও বৈদগ্ধ্যের নিঃসংশয় প্রমাণ মেলে। বিখ্যাত কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও দ্বিজ বংশীদাস ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হবেন। সত্য বটে অনেক অপণ্ডিতও কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ

করেছিলেন-- কিন্তু প্রসিদ্ধ কবিরা পাণ্ডিত্য ও কবিত্বকে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন। স্বভাব কবিত্বের চেয়ে বৈদগ্ধ্যভূষিত কবিত্বই আদর্শ ছিল সামন্তযুগে।

এর সুফল হয়েছিল যে কবিভাষা শালীন ও কাব্যশরীর নিখুঁত হয়েছে। কাব্যে মননশীলতার ছাপ পড়ে আটপৌরে ভাব কেটে গেছে। এই প্রসঙ্গে কবিতা ও শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলাওল যা বলেছিলেন, সেটা অনুধাবন করা যেতে পারে। তিনি কবিতাকে বলেছেন সমুদ্রের মত, যেখানে শব্দ মুক্তার ন্যায় এবং কবির কাজ হচ্ছে বহু যত্নকরে শব্দ সংগ্রহ করা, যেমন করে সমুদ্র থেকে ডুবুরি মুক্তা আহরণ করেন।

কাব্যসিন্ধু শব্দমুক্তা কবি সে ডুবারু।
বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচারু॥

শব্দের প্রতি আসক্তি ছিল অনেক কবির---সাবিরিদ খান ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

চার

সবশেষে বিবেচনায় আসে, সেকালে কবিতার ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি কী ছিল। প্রকৃতই কি কবিতার মূল্যায়ন করার প্রথা সেকালে ছিল? এমনিতে বোঝা যায় যে, তুলনামূলক বিচারে উৎকৃষ্ট কাব্যগুলোই টিকে রয়েছে; যেগুলো পাঠকের মনোহরণ করেনি, মহাকাল তাদের গ্রাস করেছে। যে-পুথি টিকে আছে এবং অনেক কপি পাওয়া গেছে, সেগুলোই পাঠকবিচারে নন্দিত ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। সুতরাং কাব্যের উৎকৃষ্টতার মূল বিচারভার ছিল পাঠক-শ্রোতার ওপর। কোন পেশাদার সমালোচক সেকালে ছিলেন কিনা বলা শক্ত।

তবে যেহেতু বাংলা কাব্য গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, সেহেতু সংস্কৃত কাব্য বিচারের মানদণ্ডই প্রচলিত ছিল বলেও মনে হয়। মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বেশ কয়টি টীকা-টিপ্পনি রচিত হয়েছিল। সেকথা প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধকাব্য' পাঠ করে জনৈক সংস্কৃত পণ্ডিত যে মন্তব্য করেছিলেন—

উত্তম উত্তম অলংকার আছে—সে-বিচার মধ্যযুগের বিচারের ধারা-বাহিকতা বলে অনুমিত হয়। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় অলংকার শাস্ত্র বা কাব্যবিচার সম্পর্কিত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

সামান্য কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায় এক কবি কর্তৃক অন্য কবি সম্পর্কে উল্লিখিত অভিমত পরীক্ষা করলে। তার সংখ্যাও বেশি নয়। পূর্বসুরীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করাই সাধারণ রেওয়াজ ছিল—ব্যতিক্রম হয়েছে দু-একটা। অধিকাংশ কবি নিজের দোষত্রুটির জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন—কেবল কৃত্তিবাস বলেছেন :

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

পূর্বসুরীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের একটি উদাহরণ রয়েছে পনের শতকের একেবারে শেষের দিকের কবি বরিশালের বিজয়গুপ্তের কবিতায়। তিনি আগের কবি হরিদত্তের নামের পূর্বে বিশেষণ 'কানা' অবিচ্ছেদ্য-ভাবে লাগিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি, দেবির জবানীতে বলছেন যে, হরি-দত্তের কবিতায় মিত্রাক্ষর নেই, বিষয়ের পারম্পর্যের অভাব রয়েছে, বক্তব্য সংহতিবিহীন, শ্রুতিমধুর নয়, এলোমেলো কথায় ও চালাকিতে পরিপূর্ণ। তাঁর ভাষায় :

কথার সংহতি নাহি না শুনি সুসার
এক গাহিতে আর গাহে নাহি মিতাক্ষর।

মধ্যযুগের একেবারে শেষের দিকে, বিজয়গুপ্তের প্রায় তিনশো বছর পরে, আরেক কবি রামানন্দ যতি অনুরূপ মনোভবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী ও একটি ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলীর গুরু। শিষ্যদের কাছে তিনি ছিলেন বুদ্ধের অবতার। তিনি সেকালের বাংলাদেশে ধর্মের গ্লানি প্রত্যক্ষ করে প্রতিকারার্থে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সংস্কৃতভাষায় চব্বিশটি ও বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত দুটো বই রয়েছে। দুটোর একটি হল চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল পাঠে তিনি যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন—ক্ষোভের কারণ আরো ছিল যে, জনপ্রিয়তার কারণে মুকুন্দের কুপ্রভাব সমাজে ছড়িয়ে

পড়ছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীর বিবিধ দোষ উল্লেখপূর্বক সেগুলোর সংশোধন করে তিনি নতুন করে চণ্ডীকাব্য রচনা করেছিলেন। সেসূত্রেই সেকালের কবিদৃষ্টিতে আদর্শ কাব্যের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। মুকুন্দের প্রতি যতির ক্ষোভ এত বেশি যে, তাকে গামর, গাবয়, চাষা, মূর্খ বিশেষণে বারংবার বিশেষিত করেছেন। রামানন্দের মতামত সারা বইয়ে জুড়ে থাকলেও প্রথমদিকে তার একটি সারসংক্ষেপ আছে। তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কাঁটাবন
ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল।
সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কন্টকে তাঁকে
দংশিয়া করিল বেয়াকুল॥
আরো শুন অদ্ভূত জন্মিবে ব্যাধের সুত
সেখানে গেলেন ভগবতী
কলিতে কলিঙ্গবনে কালকেতু সিংহাসনে
মল্লযুদ্ধ করিলেক কতি॥
কলিঙ্গেতে গুজরাট তাহে বাঙ্গালীর হাট
বসিল ছাপ্পান্ন গাঞি রাড়ী।
না জানে কলিঙ্গরায় বন কাটাইয়া তায়
কালকেতু করিলেক বাড়ী॥
ঘরখানা সয়াকাশ ইতে অনুভব দোষ
কালী গেল্যা বন্দ্যানের ঘরে।
কোটালের সনে রণ করেন অনেকক্ষণ
এইরূপে অপমান করে॥

অপমান করে আর কত।
দেবীর বক্ষের পরে বীরগণ চিত্র করে
কাঞ্চলীতে পশু পক্ষী যত॥[৮]

রামানন্দ মুকুন্দের কাব্যে যেসব দোষ দেখিয়েছেন, তা একটি হল কল্পনায়। মুকুন্দ কল্পিত অনেক ঘটনাই সম্ভব নয়---যেমন স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্রের বাগানের ফুলে কাঁটা ও সাপ থাকা, এবং সে-কাঁটায় আহত হয়ে শিবের ইন্দ্রপুত্রকে অভিশাপ দেওয়া প্রভৃতি। গুজরাটের

নগরীতে বাঙালী বসতের যে-কল্পনা করেছেন কবি, তা-ও রামানন্দের কাছে বাস্তবতাবর্জিত মনে হয়েছে। কবির আরেকটি বড় দোষ রসাভাসের বা রসচ্যুতির। বিশ্বকর্মা কর্তৃক চণ্ডীর বুকের ওপর কাচুলি নির্মাণ করা বা কাচুলিতে বিভিন্ন ছবি আঁকা তার উদাহরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে। ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় বিয়ের সময় রঙ্গরসের যে বর্ণনা রয়েছে, রামানন্দ তার নিন্দা করেছেন গ্রাম্যরুচির বলে। মুকুন্দের অপর দোষ বাস্তববোধ না-থাকা। যেমন—গুজরাটে বনকেটে কালকেতুর পুরী নির্মাণের কোন সংবাদ কলিঙ্গরাজ পেলেন না, সেটা বাস্তবসম্মত নয়।

গুজরাট দেশে জাত্যের বিশেষে
নাম আছে ভাগে ভাগে।
বাঙ্গালের নাম সে দেশে কি কাম
ইহা শুন্যা ধান্ধা লাগে॥

কালকেতুর একটি আংটি বিক্রি করে, হোক না সেটা দেবীপ্রদত্ত, সাত কোটি টাকা পাওয়া অবাস্তব মনে হয়েছে রামানন্দের কাছে।

সুতরাং তিনি মুকুন্দরামের কাব্যে দেখেছেন অবাস্তব কল্পনা, গ্রাম্য রুচি, দেবিমহিমার স্খলন, রসচ্যুতি ও বাস্তবতাবোধের অভাব, হিন্দু-ধর্মবিরোধী কল্পনা প্রভৃতি। দোষ সংশোধন করে তিনি একটি নিখুঁত কাব্য রচনা করেছিলেন ; কিন্তু সেটা জনপ্রিয় হয়নি।

জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে আরেকটি দিক আলোচনা করা যায়। সামন্ত-যুগের সব কাব্যের পাঠক এক ছিলনা। চর্যাপদ রচনা করা হয়েছিল একান্তভাবে সহজিয়া সাধনায় বিশ্বাসীদের জন্য—সাধারণ লোকের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য আশ্রয় নেয়া হয়েছিল সন্ধ্যাভাষার। রোমান্স কাব্য-গুলো রাজদরবারে লেখা—সেগুলোর বোদ্ধা পাঠক-শ্রোতা ছিলেন দর-বারের সদস্যরা। লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলো সাধারণ ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কথা ভেবে রচিত হয়েছিল। তাতে জনরুচির প্রাধান্য থাকা সেজন্যই স্বাভাবিক। তদুপরি, লিপিকর ও গায়েনরা অনেকস্থলেই ভাষা ও ভঙ্গী বদল করতেন লোকরঞ্জনের সুবিধার্থে। শিবের কাব্যগুলোতে গ্রাম্যরুচির চূড়ান্ত প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও অবশ্য ছিল—যেকারণে রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন—'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।'

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যের কবিরা সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দি প্রভৃতি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তুলনামূলক আলোচনার দ্বারাই কেবল সে প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা অনুধাবণ করা সম্ভব। মধ্যযুগের সাহিত্যের রসগ্রাহী আলোচনার এখনো শৈশবাবস্থা বিধায় আলোচনার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি জট খোলার জন্য গভীর আলোচনার দরকার। সামন্তযুগে গীতিকবিতা ও আখ্যায়িকা কাব্য দুই আঙ্গিকেই সাহিত্য রচিত হয়েছিল। আঙ্গিকগুলোর পূর্বরূপ সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায়না। গীতিকবিতার আঙ্গিকটির পূর্বরূপ অনুসন্ধান করা জটিলতর কাজ। চর্যাপদের কাঠামো সিদ্ধাচার্যরা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, তা পরিষ্কার নয়। মঙ্গলকাব্যের গঠন প্রণালী সংস্কৃত পুরাণ না প্রাকৃত মহাকাব্য থেকে এসেছে স্পষ্ট করে বলা যাবে না। আসলে মনে হয়, মধ্যযুগের সাহিত্য পঠন-পাঠনের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

২ মোহিতলাল মজুমদার, "কাব্যবিচার", 'কাব্য ও জীবন' (কলিকাতা : ১৩৭৩), পৃ. ৪৯

৩ উদ্ধৃত, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'মধুমালতী', (বাংলা একাডেমীর পক্ষে বইঘর ; ১৩৮০) ; পৃ. ৩

৪ 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বর্ণমিছিল, ১৯৭৮) পৃ. ৩৬৫

৫ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খণ্ড (কোলকাতা : ১৯৭০), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৩৮

৬ 'পদ্মাবতী', (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫) ২য় খণ্ড, পৃ. নিবেদন : ২৩

৭ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), ভূমিকা, পৃ. ৪৬-৪৭

৮ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রামানন্দ-যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৬৯) পৃ. ১০০-১০১